প্রথম আলো

কলাম

মতামত

প্রাথমিকে সংগীত ও ধর্মীয় শিক্ষক বিতর্ক: বাস্তবতা কী বলে

লেখা: রঞ্জু খন্দকার

আপডেট: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫৮

শ্রেণিকক্ষে বসে কাপড়ে সুই-সুতায় নকশা আঁকছে এক ছাত্রী। ছবিটি লালখান বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
ফাইল ছবি: প্রথম আলো

এলাকার ডাকসাইটে সুন্দরী ও করিতকর্মা নারী আম্বিয়ার বিবাহ। এই নিয়ে বচসা। পরীরদিঘির লোকজন চান, তরুণ মন্তু মিয়াই বিয়ে করুক। কিন্তু পাড়ার মোড়ল তিন স্ত্রীর স্বামী মকবুলের চাওয়া, বিবাহটা তিনিই করবেন।

এই নিয়ে গন্ডগোল। একপর্যায়ে বিয়েই ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। শুধু যার বিয়ে সেই আম্বিয়া কাকে বিয়ে করতে চায়, সেই মতামতটাই নেওয়া হলো না।

জহির রায়হানের যাঁরা পাঠক, তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন, কালজয়ী এই কাহিনি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের। বাস্তবে এই কাহিনি শুধু পরীরদিঘিরই নয়, এ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এটা পুরোপুরি মিলে যায়। এখন যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত না ধর্মীয়--কোন শিক্ষক বেশি দরকার, এই নিয়ে বেশ ভালোই বচসা চলছে, শুধু শিক্ষকদেরই বোধহয় মতামত নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ৬৫ হাজার ৪৫৭ টি। এর মধ্যে ৩৪ হাজার ১০৬টি শূন্য। সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদ আছে ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫৩ টি। এর মধ্যে ২৪ হাজার ৫৩৬টি পদ শূন্য। (সূত্র: প্রথম আলো, ১৫.০৭.২৫)

এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিকে এই মুহূর্তে শিক্ষকের মোট খালি পদ ৫৮ হাজার ৬৪২ টি। অর্থাৎ গড়ে ৬৫ হাজার ৫৬৭টি বিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটিই ধুঁকছে শিক্ষকসংকটে।

এবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করা বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির (এপিএসসি) তথ্য। এই তথ্য বলছে, দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৫ হাজার ৫৬৭ টি। এসব বিদ্যালয়ে পড়ে এক কোটির মতো শিক্ষার্থী।

এত বিপুল শিক্ষার্থী নিয়ে আমাদের প্রথম কথা হলো, যেখানে শিক্ষকের মূল পদই এতগুলো খালি, সেখানে ধর্মীয় হোক কিংবা সংগীতের—যে শিক্ষকই দেন, অসুবিধা নেই, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি দেন। বচসা পরে করলেও চলবে।

এখন আসি বচসা নিয়ে। এবার সিনেমা, উপন্যাস নয়, একটি প্রকৃত চিত্র। গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার কুমারগাড়ী গ্রামে ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে একটির শিক্ষক ৬ জন, কিন্তু শিক্ষার্থী শয়ের নিচে। এ নিয়ে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষককে প্রায়ই নাজেহাল হতে হয়, কটূ কথা শুনতে হয় শিক্ষকদেরও।

বিদ্যালয়টির উঠোনের সঙ্গেই একটি কওমি মাদ্রাসা। দুপাশে দুটি পুরোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই গ্রামে একটি কিন্ডারগার্টেনও (কেজি) রয়েছে।

এখন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যখনই শিক্ষার্থী সংগ্রহে অথবা ঝরে পড়া রোধে 'হোম ভিজিটে' যান, তখনই অভিভাবকেরা জানান, তাঁদের সন্তানেরা হয় ওই দুটি পুরোনো প্রাথমিক বা কেজি অথবা উঠোনের কওমিতে ভর্তি আছে।

শুধু ওই কওমি নয়, ওই এলাকার আশপাশে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই গড়ে কমপক্ষে একটি করে মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে কোনো কোনোটির কলেবরও বিরাট। তাদের যে ভবন, শিক্ষকের যে পরিমাণ, সর্বোপরি যে আয়োজন, তার কাছে বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই হাঁটু নড়বড় করবে।

৩৪ তম বিসিএসের ননক্যাডার হিসেবে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে খেয়াল করেছি, প্রাথমিকের কর্তাব্যক্তিদের কেজি নিয়ে যতটা খেয়াল, কওমি নিয়ে ততটাই বেখেয়াল। দেশে কেজি যদি গাণিতিকভাবে বেড়ে থাকে, কওমি অনেকটা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে।

আমার বিদ্যালয়ের চিত্র একটু ভিন্ন। এটি পুরোনো সরকারি। তাই শিক্ষক পদ কম--৫টি (তার মধ্যে একটি খালি, অন্যজন প্রশিক্ষণে)। কিন্তু শিক্ষার্থী শয়ের অনেক ওপরে, ১৭০। চিত্র সামান্য ভিন্ন হলেও এখানেও সমস্যা প্রায় একই। ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে একটি 'কেজি'। বিদ্যালয়ের দুদিকেই প্রায় দৌড় দূরত্বে দুটি কওমি।

সম্প্রতি 'হোম ভিজিটে' যাওয়া ৯ জনের মধ্যে ৫ জন অভিভাবকই জানান, তাঁদের সন্তানকে কওমিতে দিয়েছেন। ছোট থাকতেই যদি ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষা না দেওয়া হয়, বড় হলে কী আর হবে? ধর্ম যেহেতু সংবেদনশীল বিষয়, ফলে অভিভাবকদের মুখ চেয়ে কিছু বলাও যায় না।

৩৪ তম বিসিএসের ননক্যাডার হিসেবে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে খেয়াল করেছি, প্রাথমিকের কর্তাব্যক্তিদের কেজি নিয়ে যতটা খেয়াল, কওমি নিয়ে ততটাই বেখেয়াল। দেশে কেজি যদি গাণিতিকভাবে বেড়ে থাকে, কওমি অনেকটা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে।

কথা হচ্ছে, কওমি, কেজি--যেটাই বাড়ুক, আপত্তি নেই। যদি সেখানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে সেটা হচ্ছে কতটা?

দেখা যাচ্ছে, মফস্বলে, গ্রামে গজিয়ে ওঠা বেশির ভাগ কেজিতে শিক্ষকদের বড় অংশ এসএসসি পাস। কওমিতে যে কী পাস, তা কর্তাব্যক্তিরাও জানেন কি না, কে জানে! এসব শিক্ষকের নেই কোনো প্রশিক্ষণ, হয়তো নেই শিশুমনস্তত্ত্ব বিষয়ে জানাশোনা। ফলে, এঁনাদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা কতটা আদায় করা যাবে?

দেশগ্রামে যাঁরা থাকেন, তাঁরা খেয়াল করলে দেখবেন অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান এটুকু চান, মারা গেলে জানাজার নামাজটা যেন তাঁদের সন্তানেরা পড়াতে পারেন। শুধু এই চাওয়াটুকু পূরণ করতেও অনেকে তাঁদের সন্তানদের কওমিতে ভর্তি করিয়ে থাকেন। কিন্তু কওমি পাস করে তাঁদের কতজন একই লাইনে উচ্চতর পড়াশোনা করেন, সেটাও অনেক অভিভাবক জানেন না, করানও না। তাঁদের চাওয়া, অনেক ক্ষেত্রে ওইটুকুই। বেশি হলে 'বোনাস'।

এখন সরকার যদি অভিভাবকদের এই সামান্য চাওয়াটুকু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পূরণ করে দেয়? খারাপ কী! প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিলে আখেরে লাভ হবে দুদিক থেকে।

১. শিক্ষকসংকট অনেকটা পূরণ করা যাবে। ২. প্রাথমিকে ভর্তির প্রবণতাও বাড়বে। ফলে শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অন্তত নিশ্চিত করার সুযোগ বাড়বে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়েই যদি সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা শুরু করে দেওয়া যায়, অভিভাবকেরা কওমিতে আর কজন যাবেন? তা ছাড়া অন্য ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ দিলে, সেসব অভিভাবকও নিশ্চয় খুশিই হবেন।

সংগীতের শিক্ষকের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রায় একই মত। প্রথমত, শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ হবে। দ্বিতীয়ত, সংগীত মানে তো এখানে কথিত 'অশালীন' গীত নয়। বরং প্রাথমিকে বিশ্বসংগীত থেকে দেশাত্মবোধক গান, হামদ, নাত--এসব আগে থেকেই শেখানো হয়। কিন্তু আমরা যারা অসুরো গলার শিক্ষক, তাঁরা এটা পারি কতটা?
দেশের মসজিদগুলো থেকে ভেসে আসা আজান শুনেও তো মনে হয়, সুর শেখার গুরুত্ব কতটা? লোকগানে বলা আছে, ‘সুরে তে দেয় আজান, সুরে পড়ে কোরআন, সুরে তে ওয়াজ করে ওয়াজিন, ওয়াজিন...।’

এই দুই বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিলে কওমি ও মাদ্রাসায় যারা উচ্চশিক্ষিত, বিগত সরকারের আমলে যাঁদের স্নাতক/স্নাতকোত্তর সমমান দেওয়া হলো, তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আর বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতে স্নাতক/স্নাতকোত্তরদেরও সরকার কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারবে।

কাজেই দেশে সংগীত, ধর্মীয়--দু ধরনের শিক্ষকেরই দরকার। তবে সবার আগে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক ও বর্তমান শিক্ষকদের মতামতের।

না হলে হাজার বছর ধরে প্রাথমিকের অবস্থা সেই সুন্দরী আম্বিয়ার মতোই হবে, যাকে নিয়ে গন্ডগোল চলতেই থাকবে, কিন্তু বিয়ে আর সহজে হবে না।

- **রঞ্জু খন্দকার** লেখক ও শিক্ষক
  alamgircj@gmail.com

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো